প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ : কবির জন্মদিন

প্রকাশক : এ. এম. খান মজলিশ, নলেজ হোম, ১৪৬ গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা

মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ২

শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা

সূচীপত্র

শৃংখলিত মৃত্তিকা

স্তব্ধতার ভিতরে মানচিত্র

একুশে ফেব্রুয়ারি

আমার স্বদেশে কে বাজায় ডমরু বজ্রস্বর ?
— এক আবর্তনে ছিঁড়ে যায় ত্রিকালের
মহা-অভিশাপ। পাষাণ পৃথিবী জাগে, ঘাত-প্রতিঘাতে
সাতবোন চম্পা আমার
আপন ভাস্বতী।

কোথায় পালাবে তুমি, তোমার প্রচ্ছদে এ-বাংলাদেশ
রক্তিম-উদ্ভিদ। অমোঘ সন্তান যারা,
এখনো ধরে আছে হাল। নগ্ন নিশান ওড়ে
সারা দেশময়। আকাশে বজ্রগর্ভ, বাতাসে
বারুদ গন্ধ আর, দিক্‌দিগন্ত জুড়ে গণবিস্ফোরণ
তুমুল প্রলয়।

এসো, রিক্ত স্বদেশে বুনি
আতপ্ত প্রাণের বীজ। এসো,
সংহতির গানে-গানে, ধ্রুপদে বাঁধি আ-মরি বাংলাভাষা,
বিশ্বতান।

— আমার মুক্ত আলোয় আলোয় একুশে ফেব্রুয়ারি।

সদ্য স্বাধীন দেশে

এই শূন্যতা অন্ধকারে ভরে দাও, আমাদের পারিপার্শ্বিক
দৃশ্যমালায় আপাতত কোন মনতাল নেই। মৌলিক
বিষাদ ছেয়ে আছে ব্যাপ্ত মানচিত্র।

'আমিও মিশে যাবো এই ধূলোয়, পাথরে' ; — বসুধার কথা
মনে পড়ে। 'জীবনের বীজকম্প্র আঁধারে শস্য বজ্রের খেলা,
পারিপার্শ্বিক ছেয়ে আছে গোপন বিপ্লবে। একটি অলীক ভেলায়
চলেছি নিরুদ্দেশ ; পলাতক নই, শৃগাল হায়েনা ছাড়া আত্মীয় জনতা
সদ্য স্বাধীন দেশে হারিয়েছে যাবতীয় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা'।

১৩.৩.৭৬

আকাশকে মাটিকে দাও প্রাকৃতিক তানসেন

(শ্রী শঙ্খ ঘোষ, শ্রদ্ধাস্পদেষু)

লোকোত্তরের কি সন্ধান ক'রো জীবনের অঙ্কুর ?
বধিরের গান কেবা শোনে [illegible] ?
অশ্রুকে দাও রৌদ্রের তাপ, বর্ষাতেও হোক [illegible]।
আত্মজ তুমি, তুমি মনস্বী প্রাকৃতিক তানসেন।

দেশব্যাপী আজ মহাসংকট,
মাঠে মাঠে [illegible] বজ্রবিদ্যুৎ।
মন্বন্তর দিন নির্মোক হোক,
খেয়া পারে যাও, মিত্রতা আনো,
কাণ্ডারী !

দুঃস্বপ্নের ঘায়ে বিক্ষত মন প্রাণ ?
জীবনে মরণে তাই কি দহন, যৌবন ?
মাটিকে দেশকে দীপ্ত প্রহর দাও।

পথে পাথর কেন ঝোড়ো হাওয়া নেই,
পদ্মের দীঘি ভেসেছে নিথর জলে ?
শ্যামল স্বদেশে তোমাকে ডেকেছি যেই
আয়োজন কাঁপে কঠিন উজ্জ্বলে।

বহ্নির শিখা দিকে দিকে যাক ছড়িয়ে
আর্তনাদেই ভরুক অতন্দ্রিতি।
বিপ্লবে ভয় ? — স্বেচ্ছ ধর্মে পাথর গাঁড়িয়ে
বানাবো ঈথার, সাহসী অমরাবতী।

ঝড়ঝঞ্ঝার মত্ত সাগরে,
ঈষাণ মেঘের কালো পাঁপড়িতে,
প্রতি মরশুমে, গ্রীষ্ম ও শীতে
মৃত্যুকে রাখি অমিতাক্ষরে।

আত্মজ্ঞানই কি প্রজ্ঞার প্রতিনিধি ?
কর্ম-প্রহারে দীপ্ত প্রহরে
তোমাকেই জানি দৈব বিধি ?
— শালবনী ছায়া দিনান্তে, ঘরে ঘরে।

এ-মর্ত্যলোকে তুমি কি সঙ্গীহারা ?
মানব-সমাজে তুমিই বিশ্বত্রাতা।
বিশ্ববিজয়ী, উষ্ণ রক্তধারা
ঢেলে দাও রূঢ়, দেশজ মাটির ভ্রাতা।

তোমার ও-পথ বন্ধুর, জানি
দীর্ঘ তোমার দীর্ঘিকা শ্রম।
শিরায় শিরায় ক্লান্ত গ্লানি
দূর করে দাও, রাজন্য ভ্রম।

কেন তুমি আজ বীরের ভরসা ভোলো ?
জনসমুদ্রে তবে কি আসেনি জোয়ার ?
অঙ্গে রাখো না কারোর অঙ্গীকার ?
তাইকি এমন হৃদয় তোমার চড়া ?

বীরের ভরসা ভুলো না তুমি, যত থাক
সুজনের সভ্যতা। নিত্য আত্মীকে দাও
আকাশকে মাটিকে অশনি-মাতৃ-ভাষা।

উদয়াস্ত পথে পথে ঘুরি, জানিনা
আদি কোথা অগস্ত্য যাত্রার। বিনিদ্র রাত, দিনেরাতে
নীলকমলের দেশ। লালকমলের দল
স্বাধীন স্বদেশে ঘোরে
জীবিকার সন্ধানে। হাঁ-ঘরে সুয়োরাণী দুয়োরাণী। আর আমার
মৃত্তিকা-সন্তান, তুমি
নীলকমলের লালকমলের দেশে চড়কে মড়কে দ্যাখো

সাম্রাজ্যবাদের শান্তির নিশান,
বুলবুলি খেয়ে যায় ধান।

নীলকমলের দেশে, দিনেরাতে-বিনিদ্ররাতে
লালকমলের দল বানায় ইস্পাতে
কঠিন হাতিয়ার।

আদি কোথা কিংবা বলো শেষ কোথা
অগস্ত্য যাত্রার। পাহাড়ের মাথা নত, সূর্যও দিচ্ছে রোদ
অথচ, মৃত ইল্বল বাতাপি আবার প্রাণ পায়
ঘোরে পথে পথে। ছিঁড়ে খায়
কৃষকের মজুরের প্রাণ।

হিরণপাত্রে ঢেকেছি রাত্রি
আমরা মরুর অভয় যাত্রী
চলেছি আনতে রক্তকরবী।

বজ্রের স্বরে ডাকছি, ভাই
এসো সহোদরা, জ্বালো রোশনাই
এ-মর্ত্যলোকে প্রয়োজন নেই দিবস রবি।

অরণ্যদাহ অজ চারিদিকে। জীবনকে মরণকে জানি
জীবনে-মরণে প্রাত্যহিকে, ঊষর উর্বর দেশে, অার তরঙ্গস্রোতে,
দুর্জয় মাটিতে রণঘাটিতে
তোমার-আমার আনন্দ-ভালোবাসা।

জীবনোত্তরে সন্ধান তাই জীবনের অঙ্কুর।
বধিরের গান আমি শুনি আর শোনে বেঠোফেন।
অশ্রুকে দিই রৌদ্রের তাপ, স্মৃতি হোক ভঙ্গুর।
আত্মজ তুমি, তুমি বরাভয়, প্রাকৃতিক তানসেন।

২৩.৫.৮১

ক্ষুধার্ত পতাকা ১৯৮১

দ্যাখো, আমার পূর্বপুরুষের রক্তের ধারা এই শরীরে বহমান —
আমি, শৃঙ্খলিত মৃত্তিকার পাথর-সন্তান।

মৃত্যুর আবর্তে বহুকাল ঘুরেছি হাওয়ায় —
দেশ থেকে দেশে, অবশেষে যুদ্ধের ব্রততী নিয়ে দাঁড়িয়েছি বাংলায়।
মাটিতে স্বাক্ষর রেখে পিতাও বুনেছেন রক্ত কিংশুক
চরাচরে তাই উড়ন্ত নিশান, ঘরে ঘরে কুসুমিত সুখ।

২

— পথে পথে ঘুরি, নিঃস্রোতা দিন, জ্বলে অগ্নি, কংক্রিট-খাঁচা
সারাদেশময়। হাঁটে সরিসৃপ, উদ্ধত ফণ,
মাঠ ফেটে চৌচির। এদিকে, আমাদের অশ্রু কণা
পাথরও নেয়না। ওদিকে, পৈতৃক ভিটে
দখল করেছে নগরীর ইটে।

ইটে কি নির্মিত দেয়াল, নাকি, বাক শুধ ভিত ?
— ভিত যতই আধুনিক হোক, কোনো ষড়যন্ত্রেই ইন্দ্রজিৎ
মরবে না আর। আমাদের সারথি বলতে অভুক্ত মানুষ ; বিনা আয়োজনে
দেহপ্রাণ বন্ধক রেখে নেমেছি রাস্তায়, রণাঙ্গণে।

রণাঙ্গণও অচেনা নয়, পিতা প্রপিতামহের কাল থেকে শিখেছি
যুদ্ধই আমাদের জীবন। শত্রুকে বিনাশ করে
পিতা যখন ফিরতেন ঘরে, শুনেছি : এবার
প্লাবন রোধের পালা, যাই দেরী হয়ে গেল,
বুকের পাটায় ঠেকাবো নিশ্চিত
সর্বনাশী জল।

আমি সেই যুদ্ধবাজ পিতার সন্তান।
দেখেছি নরকের দ্বারদেশে দ্বাররক্ষীর বল্লম। কিন্তু জেনো, আমার
হাতিয়ার তারেচেয়ে মারাত্মক। প্রতিবার যুদ্ধে স্বয়ং ঈশ্বর
মানুষেরই প্রতিদ্বন্দ্বী, আর কেউ নন।

৩

কেনবা বিমর্ষ হও, কেন ম্রিয়মান —
দেশ ও দশের মননে তবে কি অভিন্ন তুমি ?
বিস্তৃত চেতনায় যে নিত্যকর্ম, লক্ষ চিত্ত উদার
তার থেকে দূরে যাবে ? — দূরে কেউ নয়।

দেশ ও দশের মাটিতে এখন জোচ্চোর ঠগ
ঘরে ঘরে কালাচিতি, উদ্ধত হায়েনা
পথে পথে ভীড় আর অফিসে আদালতে ভয় ; এই বুঝি দেশ, বাংলাদেশ
স্বাধীন স্বদেশ !

— সুদ ছাড়া কাজ নেই, মিথ্যা ছাড়া কথা নেই
পাপাচারে মেতেছে আবালবৃদ্ধবনিতাও !

-- মেতেছি সবাই। এবং চেনা মুখও মুখোশের আড়ালে অচেনা মনে হয়।
এই রীতিবাহিত ব্যাধি থেকে কি করে উদ্ধার পাবে, বলো !

— তোমার মৃত্যু আসন্ন, হে ঈশ্বর ;
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন।

৪

দুঃস্বপ্নের আঘাতে আঘাতে কেউই আর দেবেনা নীলাকাশ ?
কেড়ে নেবে প্রেম, মানবিক বোধ, শ্রম ও দুঃখের আশ্বাস ?

-জানি আমি, আমাদের যুগ নিঃসঙ্গের কাল,
পথে পথে ঘূর্ণি, ঘূর্ণি হাওয়া
পদতলে মাটি, তাও-বা উধাও ! শূন্যেই আসা-যাওয়া !

কোথা যাও, ফুলশয্যায় শুনিতেছ ক্রন্দন ?
কার ক্রন্দন ? — দুঃসহ দংশনে মরো, কার দংশন ?

শব-দেহ নিয়ে হাঁটো দিনমান, তোমারি কি দেহ-শব ?
অভিসার শেষে, তুমি আর দেহ অগ্নিতে সারো মহোৎসব ?

সেই ভালো, চিরকাল মানুষই পুড়িয়েছে মানুষেরে
নিয়ে গেছে তারে, কাঁধে করে, তারপর
চিতায় তুলে দেখেছে অগ্নির প্রতাপ, কিম্বা
কবরে নামিয়ে, মাটি দিয়ে বন্ধ করেছে দু'চোখ।
— হায়, আমাদের মানবিক প্রেম, হায় আমাদের ভ্রাতৃ সঙ্ঘ !

৫

অন্ধ করে দাও প্রভু, অন্ধ করে দাও
বিশ্বচরাচরে কেবলি রাত্রি,
চক্ষু থেকে নাই, অন্ধকার !

কে আছো পরবাসী, আমাকে নিয়ে যাও
পাথরে বসে আছি, আমি যে যাত্রী
অকূল পাথারের ; দিবসরাত্রি সবই তো একাকার !

৬

এই জনারণ্যে আমি একা, ভেসে যাই দিকচিহ্নহীন —
চৈতন্যের প্রাসাদে চড়ুক, শারীরিক প্রাণে
অস্থির মড়ক। লীলায়িত রাত আর পাংশুবর্ণ দিন,
আর, রাত্রির চাঁদও যেন শতাব্দীর ক্রূর অগ্নিবীন।

— মহাসিন্ধুর প্রাচীনতা ভাঙি সবুজেরই আত্মদানে।

জানি আমি, আমাদের যুগ নিঃসঙ্গের কাল
দুঃস্বপ্নের আঘাতে আঘাতে কেউ-ই আর দেবে না নীলাকাশ।
নিত্যশ্রম প্রায়শ্চিত্ত মেনে মধ্যবিত্তের আত্মীয় প্রণয়ে মাতি
নানা বিদ্রোহে ; বিদ্রোহ চতুর্দিকে, বুঝি তাই
ক্ষমা নেই বিরুদ্ধতার !

কে করে বিরুদ্ধতা ? — এসো, সংহতির গানে গানে,
আনন্দ-আলোকে আর পল্লবে সূর্যালোকে পাতি জীবনের সংসার।

কাকে কে করে ক্ষমা, শুনি ? — স্ফীতমান দিনের গভীরে দ্যাখো
অশ্বের ধুলো, খিড়কী দুয়ারে ছায়া। এদিকে বিবর্ণ আকাশে
মেঘের ঘনঘটা, বাতাসে বিদ্যুৎ আর ওদিকে
শ্রমিক-সংঘ নেমেছে রাস্তায়, মিছিলে। মিছিলে,
দীপ্ত পদভারে বিশ্ব কম্পিত আজ। পূর্ণতা দিকে দিকে,
যদিও, পারমাণবিক ভূখণ্ডে অমানবিক মুক্তি গান !

কালদ্রোহী নই, কিন্তু বলো অন্নপূর্ণার দেশে হঠাৎ কেন
করাল রৌদ্রের ঢেউ ? কেনবা মানুষ
সন্তান-সন্ততি ভুলে তুলে নেয় তীক্ষ্ন হাতিয়ার ?

৭

ঘৃণার নিশান উড়লো হাওয়ায়
সদ্য-শুকনো অশ্রুকণায়।

নিদ্রাহারা মানুষ যতো
ছুটছে দ্যাখো অবিরত।

কামারশালে মজুর গায় :
এই আছি ভাই মুক্তিকায়।

এই মাটিতেই জনম আমার
এই মাটিতেই মরবো
দুঃশাসনের অগ্নি-শিকল
দু'হাত-পায়ে ছিঁড়বো।

৮

আমিও তাই চেয়েছি। মড়কে উজাড় হলে
কেবা বলো দেশবাসী, কে আত্মীয়-পরিজন !

এই বুঝি দেশ, স্বাধীন স্বদেশ ! রক্তের স্রোতে
ভেসে যায় দেশ, স্বাধীন স্বদেশ। হাওয়ায় হাওয়ায়
কান্নার গান ; শুনি, পাথরে পাথরে সন্ত্রাস, আকুল বিস্ময়ে

দেখি প্রকৃতির দুয়ারে দুয়ারে
বাতাসে-নুড়িতে গোপন আরতি আর
জীবনে-জীবনে শুনি মনীষার প্রগতি !

গোপনে গোপনে খুব ক্ষয় হয়ে গেছে আমাদের —
অথচ জাগর স্বপ্নে একদা পথ বেঁধেছিনু বন্ধনহীন গ্রন্থি।

৯

কাল রজনীতে দেখি ঝড় হয়ে গেছে রজনী দত্ত লেনে —
—ভেঙে গেছে ঘর, ছাউনির ঘর
আমাদের দিন-আনা সংসার।

সংসারে আজ হায়েনা গোখুরা বসে আছে ওৎ পেতে
আমি আছি, কে যে খাদ্য কেবা জানে !

এমনই দিনকাল। দিনে দিনে বেড়ে ওঠে বকাসুর,
বকাসুর দেশব্যাপী।

পিপাসিত আমি, জল দাও। আমার শরীরে শুধু
শুকনো ডালপালা। পাখিও বসেনা, অথচ উজ্জীবনে
চাই বসন্ত বাহার। নির্মল আকাশ চাই
স্বাতী শতভিষা !

কে তুমি কোথায় যাও ? — যেতে যেতে শুনতে কি পাও
কালের যাত্রার ধ্বনি ? — নাকি শোনো
পথে পথে শুধু শ্বাপদেরই নিশ্বাস !

নিশ্বাসে মাটিও পুড়ে ছারখার। সূর্যকে বৃথা দিই দোষ।

দেশকে সত্যিই ভালোবাসি আমি, কে না বাসে, বলো।
দেশ ও দশের জন্যে আজও প্রাণ দিতে প্রস্তুত ; দিয়েছেন পিতা,
পিতামহ, আমার পূর্বপুরুষ। আমি তাদেরি সন্তান।

বহুবার এই মাটি পরেছে শৃঙ্খল, বহুবার
শত্রুকে বিনাশ করে বুক দিয়ে ঠেকিয়েছি প্লাবনের জল।
— অথচ কুটিল বিন্যাসে আজ পার্থও ভিক্ষাজীবী !

— আর কিছু নয়, রক্তপাতেই আমি দেব দিশা !

মে দিবস

মে দিবস দিচ্ছে ডাক
স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক।

তুমি দাও জীবনের গান, আমি দিই জীবনের প্রহরে ঊষার আলোক।

— জেগেছে শ্রমিক জেগেছে কৃষক জেগেছে দেশের মানবিক সত্তা।

স্বচ্ছ আকাশ আজ রক্তধোয়া নীলাকাশ, সূর্যের
প্রচণ্ড দাবদাহে মাটিও অগ্নিকান্ত। পাণ্ডুর স্বদেশে তাই
হানো উদ্ধত হাতিয়ার। রাজন্য ভয়ে কে কবে স্বাধীন, বলো !
মুক্তির আশ্লেষে তুমি ছিন্ন করে দাও সমস্ত শৃঙ্খল।
উন্মুক্ত প্রাণে নাও মৈত্রীর বাতাস।

আমাদের পাথরের পুঁথি আজ রক্তের অক্ষরে উজ্জ্বল।
দেশব্যাপী তাই ঊর্মিকলরোল। তরঙ্গস্রোতে কিম্বা হিমযুগেও
মুছবে না এই নিখিল-ইতিহাস। রক্ত ও মৃত্যুর বিনিময়ে
জ্বালিয়েছ ত্রিকালের অমোঘ প্রদীপ।
— নিগূঢ় সুন্দর আঁধারও আজ ধ্রুমলোচন দেয়ালি।

—হে শ্রমিক, তোমাকেই দিতে চাই 'দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা'।

পাথরও ক্ষুধার্ত আজ

শুধু মানুষই নয়, পাথরও ক্ষুধার্ত আজ তাকে দাও তৃষ্ণার জল।
মাঠ ফেটে চৌচির, বৃক্ষও পত্রহীন।
বনে বনে পাখি নেই, আজন্ম কান্নার কোলাহল
শুনি দেশময়। পথে প্রান্তরে বুভুক্ষু দিন।

পাথরের ভাষা বুঝি, সে বড়ো মর্মান্তিক —
ঘৃণার আর্তনাদে বুক তার পাংশু, বিবর্ণ।
দীপিত আঁধারে তাই বাসুকীও একান্তিক
পেতে চায় উত্তাপ, মাধুরী, মৃদুপর্ণ।

পাষাণের বুকে যে ভাষা ধ্বনিত বহুকাল, স্মৃতির সুগন্ধে
তাই কি নির্মম ? — মর্মবিহারী গানে আমি পাই ঈষাণী-আমন্ত্রণ।
দিব্য আঁধারে দেখি উজ্জ্বল শিলালেখ, আর ঈথারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বাজে পাথর ও প্রকৃতির বিধুর ক্রন্দন !

জননী জন্মভূমি

বিশ্বচরাচরে তোমার যে ব্যাপ্তি, তাকে আমি চিনেছি শৃঙ্খলে —
প্রাকৃত-মূঢ়তা ছিল না কোনদিন , অথচ রক্তের ঊর্মিল জলে
ভেসেছে মানুষ। খরতোয়া নদী, কাল থেকে
বহেনা কালাতীত। জল ও বালুকায় ঢেকেছে নিজেকে।

-- আমাদের সংসারে ওই বসে আছেন রক্তভুক ঈশ্বর।

— জানি আমি, প্রকৃতির খোয়াড়ে খোয়াড়ে তাঁর কণ্ঠস্বর
শ্বাপদের চেয়ে ক্রুর, হিংস্র, বলব না। এদিকে, অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলা
ভুলেছে তার কাম ও শিল্পকলা।

পাপাচারে ডোবে দেশ ; আত্মিক সত্তায়
খুলে নির আবরণ, অথচ শ্মশানে প্রান্তিক ঊষায়
ফুটেছে রক্তকরবী। তাকে তুমি সাজাও পাথরে।

পাথরের বুকে আমি আগুনের অক্ষরে
রচেছি সিন্ধুনী। জননী জন্মভূমি তোমারই পূরবীবিভাসে
বাঁচি-মরি আনন্দ-উল্লাসে।

জন্মে জন্মে আমি বিদ্রোহী

আমাদের স্ফুরিত বৃত্তে পূর্ণতা আনো, পুণ্য শ্রাবণী —
রিক্ত স্বদেশে আজ ব্যাপ্ত অন্ধকার , নৈতিক আন্দোলনে
একমাত্র তোমাকেই জানি সত্য, আনন্দিত, উন্মোচনে।

পেয়েছ প্রকৃতি, কেননা মানুষ মঞ্জরী শস্যের প্রেমিক।
সৃষ্টিমগ্ন আহ্বানে তুমি পেতেছ সংসার। তোমার চারিদিক
আজ বোধের শূন্যতা, দীর্ঘ অমানিশা, আর মাতাল তরণী।

জায়মান দিনের গভীরে কি উতরোল দুঃখের ঘ্রাণ,
অবিরাম বৃষ্টিপাত আর অসুখের পুনর্নির্মাণ ?
— জটিলতা ছিন্ন ক'রে কে যায় প্রবাহিত নিকাশ ?   শতপাক
উদ্ভিদে তোমারও জীবন ; যে যায় ছিন্নমূলে, যাক।
ভয়ংকর ঝঞ্ঝার গভীরে ওই সমাহিত জল ; ছোট তরঙ্গ, বন্যায়
ডোবে দেশ ; — আমি, জন্মে জন্মে বিদ্রোহী ; ফিরে আসি বাংলায়।

সংগোপনে উঠে আসে দেশ

ছিল অন্ধকার, অনিশ্চিত পরিবেশ। এলো বিগ্রহ,
নিঃসঙ্গ-কাল। প্রাত্যহিক দিনযাপনে শুধু একাকীত্ব।
স্নায়ুতে বাড়ে চাপ। শতাব্দীর শেষ লগ্নে প্রতিটি গ্রহ
আবার চঞ্চল ; জন্ম শুধু মৃত্যুর দিকে। বনাঞ্চল শিহরিত

দক্ষিণ মেরুতে। যৌবনের অর্ধেক-কাল প্রবাসী —
দিনমান পাণ্ডুর বিষণ্ন, বেলা যায় অন্বেষণে।
"হাওয়ায় ছিল কী প্রসন্নতা ? অবিনাশী
আত্মায় ধরে পাথরের আদ্রতা ?" - ব'লে আমি যতদূরে যাই, সংগোপনে
উঠে আসে দেশ, মাতৃভূমি এমনই আপন। তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যায় তীর,
ধরে থাকি হাল।

সতত প্রভু তুমি জানো, স্থির
তিমিরে বিশ্বের জন্ম ; অকর্ষিত ভূমিতে ফসলের ঘ্রাণ। "আমার
উত্তরাধিকারী একদিন খুঁজে নেবে শস্যের খামার। বিপর্যয়ে,
কোলাহলে কোথায় যাচ্ছো তুমি ? — সম্প্রতি বাংলার
মাটিতে আবার রক্তবীজ। — আমাদের জয় পরাজয়ে
শুধু বিপ্লব আর কঠিন সংঘাতে বেঁচে থাকি অকাল মরণে।"

— ওষ্ঠে বাজে স্বাদেশিক গান। যতদূরেই যাই, সংগোপনে
উঠে আসে দেশ। — "তুমিই আমার অরুণার চেয়ে প্রিয়
বাংলাদেশ ; তোমাকে ভালোবাসি অস্থিমজ্জাসহ ; গভীর আয়োজনে
ধরে রাখি তোমার মূরতি ; তুমি আমার সকল ঐক্যবদ্ধ প্রেম, উত্তরীয়"।

একিলিস

শুধু বন্ধু নয়, দেশশুদ্ধ লোক আজ নিহত ; তোমার
দোরগোড়ায় যুদ্ধ, একিলিস। শত্রুপক্ষ ছেয়ে আছে স্পার্টার
যোদ্ধাবৃন্দ। তোমাকে দেখতে চাই রণাঙ্গণের পুরোভাগে।

এইতো সময় ; জিউসও চেয়ে আছেন, তোমার ক্ষীপ্র রাগে
কি ভাবে ছিন্নভিন্ন হবে যুবরাজ হেক্টর, ট্রয়ের রাজপ্রাসাদ।
— ভীষণ প্রতীক্ষায় আছি, দেশব্যাপী উন্মুখ ; — এ্যাপোলোও
গুনছেন পরমাদ।

মৃত্যুর হাহাকারে বাতাস মুখরিত ; এদিকে আকাশ
রক্তবর্ণ আর মাটিও অগ্নিগর্ভা ; — আমি দাসানুদাস,
মৃত্যুর ভিতরে আছি, আছি প্রত্যেক। — সমগ্র দেশের
ভার তোমাকেই নিতে হবে, একিলিস। তুমি কি প্যাট্রোক্লাসের
শরীরে শত্রুপক্ষের যাতনা-চিহ্ন দ্যাখোনি ? — পথে পথে বনে বনে
ত্রিকালহন্তাপাপী ঘোরায় বল্লম মহা উল্লাসে। — রণাঙ্গণে
মৃত বন্ধুও চায় তোমার দীপ্ত অভিযান। — আমি চাই
সজ্জিত মারণাস্ত্রে তুমিই বাজাবে নিশ্চিত জয়ের অমোঘ সানাই।

পথিক, দাঁড়াও ক্ষণকাল

বাস্তুভিটায় চড়েছে ঘুঘু, রঘুবংশের শেষ।
— প্রগলভ যারা, আজো বলে : প্রজারাই দায়ী। তারাই করেছে গ্রাস
বাংলার মাটি।

মানি আমি এ-কথা। দেখি, পথে পথে
বুভুক্ষু মানুষ
খোলা আকাশের নীচে
ভেসে যায় একা।

২

দ্যাখো, আমাদের এই দীপ্ত দেশে
গমকে গমকে ঘূর্ণির তালে যারা বেঁচে মরে আছে,
অগ্নিকুণ্ডে মাথা রেখে গায়
নশ্বর জীবনের গান

৩

— তুমি পথিক, দাঁড়াও ক্ষণকাল। দ্যাখো, আমার
বাংলার মানুষের পদতলে আজ
শুধুই শূন্যতা আর ঘন-বিস্তৃত কালো অন্ধকার।

রাজার প্রজা

আমরা যখন গিয়েছিলাম দুপুর ছিল অস্ত
ছায়ালোকের গোলঝুঁটিতে জলপ্লাবনের মস্ত
আকার ধারণ করে আছেন পত্ররাশি-বিশ্ব
আমরা যখন গিয়েছিলাম সবাই ছিল নিঃস্ব।

আমরা যখন গিয়েছিলাম রাজার বাড়ি বন্ধ
কিংবা এমন হতে পারে দেখার চোখ অন্ধ
চোখে কিছুই ভাসছিল না, আসছিল না গন্ধ
কৃষ্ণচূড়ার পরম্পরা সেই দেখেছি মন্দ।

আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ছিল চৈত্র
সঙ্গে ছিল যুবা-পুরুষ, প্রৌঢ় ছিলেন মৈত্র
অন্ন-ক্ষুধায় কেঁদেছিলাম, চেয়েছিলাম খাদ্য
রাজার প্রজা ভয় দেখিয়ে বাজায় অস্ত্র-বাদ্য।

একালের ছড়া

আমরা দু'টি ভাই শিবের গাজন গাই
বাংলাদেশের গরীব চাষীর রক্ত চুষে খাই।

আমরা দু'টি ভাই শিবের গাজন গাই
খাল কেটে কুমির আনি বলার কেউই নাই।

আমরা দু'টি ভাই শিবের গাজন গাই
কথায় কথায় কামান দেগে ঘরবাড়ি জ্বালাই।

আমরা দু'টি ভাই শিবের গাজন গাই
মার্কিনী বিমান চ'ড়ে বন্যা দেখতে যাই।

আমরা দু'টি ভাই শিবের গাজন গাই
কৃষকশ্রমিক উঠছে জেগে পালাই পালাই।

আমার কাজ শুধু কবিতা লেখা নয়

আমার কাজ শুধু কবিতা লেখা নয়,
আমি কৃষকের সন্তান।

আমার পিতা, সেই দুর্দান্ত পুরুষ ; যিনি
এখনো হাল ধরে, প্রচণ্ড রোদ্দুরে জলে ভিজে
মাঠে মাঠে ধান বুনে মহীয়ান ; আর
আমার প্রপিতামহ, মৃত্যুর আগে
মাঝে মাঝে কলমের বদলে
লাঙল ধরতে বলেছেন।

আমি তাদেরই সন্তান, আমার কাজ শুধু কবিতা লেখা নয়।

মাঝে মাঝে তাই কলম নামিয়ে
ঐক্যবদ্ধ জনতার সাথে হেঁটে যাই।
মাঝে মাঝে তাই লাঙলের বদলে শত্রু বিনাশক বেয়োনেট
তুলে নিই।

আমার কাজ শুধু কবিতা লেখা নয়,
প্রয়োজনে আমি যোদ্ধা ও কৃষক।

দধীচির অস্থি

রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

হয়তোবা সবাই পলাতক, কিন্তু আমি জানি
ঠিক প্রয়োজনে
যে যার মতো বেরিয়ে আসবেই।

আমি জানি, শান্ত হাওয়ার মধ্যেই ভয়ংকর
প্রলয় লুকিয়ে থাকে। আর,
চৈত্রের প্রচন্ড দাবদাহে যখন
মাটি ও আকাশ অসহ্য হয়ে ওঠে
ঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণে, নদীও
দিকশূন্য হয়ে যায়।

আমি জানি, গোপনে গোপনে
দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশিক্ষায়
পান্ডব বংশীয়রা আরো বেশি
যোদ্ধা হয়ে উঠেছেন। আর,
দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্র
আমাদের হাতে হাতে
অসুর বিনাশক পিনাকী।

—ইতিমধ্যে, বিশ্বামিত্র আমাদের
অস্ত্রের শিল্পিত স্বভাবের কথা
বিশদ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ী রক্তকিংশুক

সারা দেশ আগুনের মতো
দাউ দাউ করে জ্বলছে।
কেউ যে নেভাবে, আপাতত
তেমন কাউকে দেখছি না।
যাকেই দেখি, মনে হয়
এইমাত্র আগুনের মধ্য থেকে
উঠে এসেছেন ; মনে হয়
অগ্নি ঝলসানো কংকাল
ঘুরছে সমস্ত দেশময়।

না ভাই, এইভাবে আর চলতে পারে না,
একটা কিছু বিহিত করতে হবে।

মানুষও চায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে।

না, শুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজবে না।

বরফ গলছে, দেখবেন
পাথরও গলবে।

হাঁ, তার আগে
মৃত্যুকালীন চিরমাতৃভাষা সঙ্গী করে,
জীবনকে পদতলে রেখে
বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেব
মৃত্যুঞ্জয়ী রক্তকিংশুক।

আমি চাই

না, ঠিক এ-ভাবে নয়।
সময়কে দাঁড় করিয়ে, পাথরে
পাথর ঠুকে
আগুন জ্বালানোর পক্ষপাতি আমি নই।

আমি চাই বিধ্বংসী ঝড়কে মাথায় নিয়ে
প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে
আঘাতের পর আঘাত হেনে
সমূলে উৎপাটিত করতে।

না, সোজা আঙুলে ঘি আর উঠবে না।

এখন আমার কী করণীয়,
কোন্ পথে যাবো
কেন যাবো,
সবকিছু ঠিকঠাক করেই
পথে নেমেছি।

কর্কট-শৃঙ্খল ভেঙে

না হে, শাক দিয়ে মাছ আর ঢাকা যায় না।
থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ছে।

না, আমরা এখনো মরিনি।
বারুদের ভিতরে দাঁড়িয়ে
দীর্ঘ ন'মাস
এই দেশের জন্যে
কী কাণ্ডই না করেছি।

তখন যারা
স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল,
আমাদের মাথার জন্যে যাদের
মাথা ব্যথার অন্ত ছিল না,
তারাই আজ সিংহাসনে বসে
মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছেন।

ছি, ছি লজ্জায় নাক গেল।

ধরণী দ্বিধা হও।

না হে, এসব মিথ্যাচার আর মেনে নেয়া যায় না।

আমরা এখনো মরিনি।
বারুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
পুনরায় ঘোষণা করছি :
কর্কটশৃঙ্খল ভেঙে
পোড়াবো রাজ-সিংহাসন।

সময় আসছে

এক মাঘে শীত যায় না,
সময় আসছে।

মাসী লো, যদির কথা নদীতে ফেলে
ঠিক ক'রে বল্
ফুঁ দিলেই কি সব আগুন নিভে যায় ?

মাসী লো, আমার নীরবতা মানে চুপচাপ নয়।
রাজনীতিবিদ বেশি কথা বলে ; যোদ্ধারা
কথার বদলে শত্রুকে বিদ্ধ করে ; মাকড়শা
নিঃশব্দে জাল বোনে। আর সেই জালে,
রক্তখাকী মশাও প্রাণ দেয়।

— 'চুপ কর, বাতাসেরও কান আছে।'

হ্যাঁ মাসী, আমি বাতাসকে উচ্চকণ্ঠেই বলছি :
সারাদেশব্যাপী জ্বালাবো অগ্নিশিখা।

মানুষ তুলে নিচ্ছে একাঘ্নী বাণ

কি আর বলবো বলুন, দিনকাল যা পড়েছে
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

না, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমিই শুনতে ভুল করেছিলুম।
তাছাড়া, ইদানিং চোখেও একটু কম দেখছি।

এখন আর আকাশকে ঠিক আকাশ ব'লে চিনি না, মনে হয়
নীলিমার ভিতরে দাউ দাউ করে
আগুন জ্বলছে। মনে হয় সমস্ত আকাশ জুড়ে ভয়ংকর সারপেন্ট
অগ্নিফণা তুলে হাসছে।

হাঁ, আমি কমই দেখছি। নদীগুলো এখন
শুকোতে শুকোতে
ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠছে। পাখিগুলো
শস্যের বদলে খুঁটে খাচ্ছে মানুষ। আর,
পাথরের চোখ থেকে যে-জল বেরিয়ে আসছে, আমি জানি
আমার পূর্বপুরুষের রোদনের ধারা
এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

হাঁ, আমি কমই দেখছি। বাংলার মাটি
পুনরায় লাল হয়ে উঠছে। মানুষগুলো মরিয়া হয়ে
হাতে তুলে নিচ্ছে একাঘ্নী বাণ।

না, আমার শুনতে ভুল হয়নি। আকাশ বাতাস মথিত করে
সংঘবদ্ধ জনতার পদধ্বনি
ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

না, আমার শুনতে ভুল হয়নি ;
আপনার ?

আমাদের করণীয়

আমরা বললুম :
জিন্দাবাদ।
তক্ষুনি,
সমস্ত আকাশ ধোঁয়ায়
ধোঁয়াকার হয়ে গেল।

আর,
বাতাসে বারুদ গন্ধ, আর
রাস্তায় একগঙ্গা রক্ত বইয়ে দিয়ে
তিনটে কালো গাড়ি, যেন
তিনটে যমদূত
গন্তব্যে এগুচ্ছে।

এত মৃত্যুর পর
আমরা কি শোকস্তব্ধ ?

— এসো, শহীদের সমাপ্ত কাজগুলো
হাতে হাত মিলিয়ে
সেরে নিই।

কুলীন ব্রাহ্মণও ভুলে যায়

দ্যাখো, অভাবে পড়লে মানুষ কতদূর যেতে পারে, যায়।
ওই যে লোকটি,
একদা ওঁর চোখের ইশারায়
নদীর স্রোতও বাঁক নিতো
অবলীলায়।

দ্যাখো, মানুষের কাঁধে বন্দুক রেখে
যে-রাজার দল যুদ্ধে যেতেন ; দিনগুলো
ভারী দামালো। রাজার কাঁধে বন্দুক রেখে
প্রজারা বলছে :
সামনে চলো।

তুমি ভাবো অসহায় ?
— ঐক্যবদ্ধ জনতার কাছে
কুলীন ব্রাহ্মণও ভুলে যায়
গীতার শ্লোক।

মহাকালব্যাপী সুন্দর

আমরা ফিরে এলাম সূর্যাস্তের বিপরীতে, যেমন ফিরে আসে
যুদ্ধ বিজয়ী সৈনিক।
রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন ক'রে
আমাদের যাত্রা শুরু হলো
ঊষর উর্বর দেশে। আমাদের বুকে ছিল
রক্তকিংশুক, আর
বর্শায় গেঁথে নিয়েছিলাম
একেকটি সকাল।

অপূর্ণতায় কেউ কখনো সুখী নয়। গিরিমরুকান্তারে
যে-যুদ্ধের স্মৃতি ছিল আমাদের ; আমরা
আরো বেশি মৃত্যুঞ্জয় হতে চেয়েছিলাম,
এই নদীমাতৃক বাংলায়।

— আমরা চলেছি রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন ক'রে
আমার দেশের জন্যে ছিঁড়ে আনবো
মহাকালব্যাপী জীবনের সুন্দর।

শকুনির পাশা

স্বদেশ সংসার বাজি রেখে বড়ো ভয়াবহ খেলায়
        মেতেছ তুমি, এ-খেলা তোমার স্বাদেশিক নয়
কৌরব ছেয়ে আছে চারিদিকে, সাবধান।

এ-খেলায় হেরে গেলে তোমার মাতৃভূমির অধিকার ছেড়ে
পথে পথে ঘুরবে, জেনে রেখো
বাণপ্রস্থে কোনো গৃহ নেই ; গোখুরা চন্দ্রবোড়া ওৎ পেতে বসে আছে।

এ বড়ো ভয়াবহ খেলা, হে রাজন,
এ-খেলায় হেরে গেলে নিশ্চিত জানি
ঘর বাড়ি-জায়া জননী জন্মভূমি সব কেড়ে নেবে
        কৌরব-বংশীয় ক্রুর দুর্যোধন।

শৈবাল-শিকড়ে

তুমি ঠিকই বলেছ : মানুষের মূল্য বাড়ে না বাজেটে —
গনগনে আগুনের মধ্যে যে মানুষ
নিজেকে শুদ্ধ করে, খেয়াড়ে খোয়াড়ে তাঁর
জীবন বসতি।

তুমি ঠিকই বলেছ : যত দিন যাচ্ছে, খাদ্যাভাবে
আরো বেশি নুব্জ হয়ে আসছেন।

এখন, মৃত্যুর আর্তনাদে বাতাস মুখরিত ; আর
মাটির ভেতরে গভীর ক্রন্দন ; যেন পাতালেই বানিয়েছে জীবনের সংসার
তুমি ঠিকই বলেছ। মাটির গভীরে যে ক্রন্দন, একদিন
সমুদ্র-প্লাবনে ভেসে যাবে গোটা দেশ, আর
শৈবাল-শিকড়ে ব্যাপ্ত হবে অনন্ত গূঢ়মূল।

ম্যাক্সিম গোর্কি সদনে চুনিয়া

আমরা কি যেন ফেলে এসেছি —
আমাদের সেই ফেলে-আসা স্মৃতি
গাঢ় বেদনায় সংক্রামিত হলো ; যখন
কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
ম্যাক্সিম গোর্কি সদনে
রফিক আজাদের চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া
কবিতা পড়ছিলেন।

আমরা কি যেন ফেলে এসেছি —
আমাদের সেই গ্রাম, আদিগন্ত ফসলের মাঠ, বনভূমি আর
সবুজ-শান্ত বাংলাদেশ।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী, বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গীয় —
ফেলে এসেছেন শৈশব, চছলছল নদী, নিকোনো উঠোন আর
একাদেক্কার বিস্তর বন্ধুবান্ধব।

"চুনিয়া বিশ্বাস করে
শেষাবধি মানুষেরা হিংস -দ্বেষ ভুলে
পরস্পর সৎ প্রতিবেশী হবে"।
— থামলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

— আর কোন কথা নয়, আর কোন উচ্চারণ নয় ; যেন এক্ষুনি
সেই "স্পর্শকাতরময় নাম" ভেঙে যাবে,
'অন্তর্হিত হবে তার প্রকৃত মহিমা'।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী, হাততালির বদলে সমস্বরে গাইলেন :
আমাদের চুনিয়া দীর্ঘজীবী হোক
চুনিয়াকে এইভাবে বুকে নিয়ে
বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

একজন অতিশয় বৃদ্ধ, আমার পিতার বয়সী
যেন সবাইকে মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়ে বললেন
আসুন, চুনিয়ার সম্মানে আমরা
এক মিনিট নীরবতা পালন করি।

আসাম ১৯৮০

যেন বাবেল থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম —
দিনের তাপমাত্রায়, রাত্রির অন্ধকারে, গভীর ষড়যন্ত্রে
পিতৃহীন মহাদেশে
ঠিকানাবিহীন আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

আমরা ফেলে এসেছি আমাদের মাতৃভূমি
গোলাপিরিচের মতো ঘরগেরস্থালি, চাষজমি
পুকুর, আমবাগান, আরো কিছু অতিরিক্ত।

ক্রমাগত যাত্রায় আমরা চিনে নিচ্ছিলাম
রণভূমি, সৈনিকের কুচকাওয়াজ, গ্রাম্যমোড়লের বাচালতা
বজ্রসেগুন, প্রেম-বৈষম্য আর
মর্মর পাতায় বাসস্থান।

আমরা, যুদ্ধের বদলে ভালোবেসেছিলাম সৌহার্দ্য ও জাতীয়তাবোধ
ভুলে গিয়েছিলাম দুঃখ ও ভাগ্যবিপর্যয়
মাতৃভাষায় শিখেও ি [illegible] াম 'সহাবস্থান'।

কিন্তু আমাদের পরিচয় হলো ভিনদেশী, অনাত্মীয়, কালকূট
আমরা, সমস্ত শোকচিহ্ন মুছে ফেলে
জেনেছিলাম এইদেশ মাতৃভূমি, স্বদেশ।

অথচ এখন আমাদের অস্তিত্বটুকু নেই
নিরাপত্তা এবং প্রাণের অস্তিত্ব বিপর্যয় —
— তবে কি আমাদের সব ঘরগেরস্থালি অচেনা নগর ?
জেরুজালেম কি বহুদূর, অন্যকোন গ্রহ ?
এই বিতাড়ন কি শতাব্দীর মানবিক পরিভ্রমণ ?

— বাংলা থেকে ছিটকে পড়া এককোটি মানুষ
তোমার এই বিশ্বচরাচরে, হে প্রভু
আশ্রয়-প্রার্থী।

আমাদের জমিদারীর গল্প

একদা আমাদের খুব বড়ো জমিদারী ছিল
ছিল নাটঘর, ছিল নর্তকী, ছিল পানশালা
ছিল দাসদাসী, ছিল মালী, ছিল বাগানবাড়ি।

ছিল আমাদের অগুনতি প্রজাবৃন্দ, ছিল লাঠিয়াল
ছিল বরকন্দাজ, ছিল খেতখামার, ছিল গোলাভরা ধান
ছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ।

আজো আমাদের সব কিছু আছে —
আছে সরকার, আছে পাইকপেয়াদা, আছে খাজাঞ্চি,
আছে ঋণের ঝাঁকা, আছে দারিদ্র্যের গর্ব,
আছে ভাঁড়ার, আছে শূন্য, আছে রুক্ষ-শুষ্ক বাংলাদেশ
আছে রক্তের বিনিময়ে কেনা অস্ত্রের ঝংকার।

আছে, আমাদের সব কিছু আছে —
আছে এই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে লাঙলের বদলে সৈন্যের কুচকাওয়াজ।

স্তব্ধতার ভিতরে মানচিত্র

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

উদয়াস্ত ফিরছি মনে, মনে-মনে
সেই কবে থেকে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে —
অচেনা নগর, অনাত্মীয় আকাশ আমাকে দিয়েছে প্রেম, উত্তাপ,
সাহচর্য। তবু আমি ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি
পিতৃহীন স্বদেশে আমার।
জানি আমি, শত্রুপক্ষ ছেয়ে আছে সারা দেশ —
চারিদিকে, রক্তচক্ষু আর শ্বাপদের নিশ্বাস ; তবু আমাকে
যেতে হবে একবার ; আমি,
পিতার জ্যেষ্ঠা সন্তান ; জনকজননী প্রিয় সহোদর এমন কি
আমাদের আদরের কনিষ্ঠ অবুঝ রাসেলও গুলিবিদ্ধ,
মৃত আজ। হয়তো দেখব ফিরে
বত্রিশ ধানমণ্ডির মাটিতে ও ঘরে
রক্তাক্ত মানচিত্র সারা বাংলায়। আর সেই স্তব্ধতার ভিতরে
পিতার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর
ডাকছে আমাকে, পিতা নেই।

২

ফিরে যাচ্ছো, ফিরেছো যেন হে গ্রীসিয় ইলেক্ট্রা
ফিরেছো স্বদেশের বিরাণভূমিতে, ফিরেছো দীর্ঘ প্রবাসের পর
ফিরে যাচ্ছো ; কিন্তু জেনো, তোমার চারপাশে বন্ধুর ছদ্মবেশে
কেউ কেউ আজও রক্তচক্ষু ; আর, তোমার দুঃখের ভার
শুধু তোমাকেই নয়, একদিন আমাদেরও নিতে হবে ; সেদিন
খুব বেশি দূরে নয়।
কলকাতার বিমান বন্দরে তোমাকে দেখলুম, হে ইলেক্ট্রা —
দেখলুম, তোমার চারপাশে যেন জাংস্কোর ছবির সেই
রক্ত-রঞ্জিত বিমান
উড়ে উড়ে মহড়া দিচ্ছে আরেক রক্তের বিপ্লবে !

নজরুল ইসলাম

আমার প্রাকৃত ভালোবাসা আপনার জন্যে — নজরুল ইসলাম।

যখন ক্যাম্পে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম,
মনে পড়তো আপনার কবিতা।
বিস্তৃত আকাশ জুড়ে যে-সবিতা
জ্বলতো মাথার উপর, দেখেছি তার
রশ্মিতে গনগনে আগুনের হল্কা। আপনার
বিদ্রোহীর প্রতিটি লাইন
আমার কাছে শক্তিমান মাইন
ব'লে মনে হতো। কাঁধে ঝুলিয়ে মর্টার
ছুটেছি রণাঙ্গণে। তখনকার
সব কথা এখন বোঝানো যাবে না। আপনি আমার
সঙ্গী ছিলেন। আপনার এই রূপময় বাংলার
প্রতিটি গাছপালা গৃহ-অঙ্গন নদীমালা
ডাকতো গভীর স্নেহে। একজন কিষাণবালা
সাক্ষী আছে এসবের। আপনি ছিলেন আমার
একান্ত বান্ধব। অগ্নিবীণার কবিতায় শুনেছি ঝংকার,
ত্রিকালের। অথচ ইদানিং আপনার কবিতার শরীরে
নির্মম ছুরি আর সুপ্রিয়-বলাৎকার। গভীরে
আরো কত কি যে হয়, মৃত ও জড় মানুষের পক্ষে বোঝা দায়।

— শুধু আপনিই নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ-বাংলায় ধর্ষিত, মৃতপ্রায়!

ঋত্বিক

তুমি হেঁটে যাও একা
ওই স্বর্ণরেখা
দেখা
যায় দূরে।

এই নিমগ্ন দুপুরে,
ভাঙা অ্যারোড্রাম জুড়ে,
কে আর ঘুরে ঘুরে
বলো, পেতে চায় মেঘে ঢাকা তারা !

যারা
এ-তাবৎকাল গেয়েছে মৃত্যুর গান,
তোমার আপন সন্তান
তুলেছে একাঘ্নী বাণ।

এই পৃথিবী একদিন যান্ত্রিক
হয়ে গেলে, তুমি ঋত্বিক
বেঁচে থাকবে তিতাসে, কোমলগান্ধারে।

অকূল পাথারে
ভাসিয়ে জীবন মেতেছিলে উৎসবে।

কার উৎস, কিসেরই-বা উৎসব ? — গোপন বিপ্লবে
ভরে গেছে দেশ।
অনিঃশেষ
ব্যথা ও বেদনায়,

মহাসিন্ধুর করুণ মোহনায়
কাঁদে জল,
অবিরল।

ঋত্বিক,
সমস্ত লৌকিক
প্রেমাচারে তোমাকে আমার চাই।
মরণ নৃত্য দেখি নাই,
দেখিয়াছি রক্তরাগ ঊষার ললাট।

মাঠ
ফেটে চৌচির।
অস্থির মানুষ ছুটিতেছে দিগ্বিদিক। অকুণ্ঠ ভালোবেসে,
নীলকমলের দেশে
তোমাকেই চিনেছি ঈশ্বর।

অবিনশ্বর
নই, প্রত্যহ
বিপুল সমারোহ
দেখি কৃষকের মজুরের।

"হে জনবের
ইচ্ছায় কেউ নয়
মৃত্যুঞ্জয়"।

ব'লে তুমি নিজেই দাঁড়িয়েছ শালবনে —
যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। রাতবিরেতে, রণাঙ্গণে
গেয়েছ সমবেত মৃত্যুর গান।

আকাশের নীল ঐকতান
ভেঙে কোথায়
ছুটে যাও, অসীম শূন্যতায়?
— শূন্যতাময় ভরে আছে ক্রন্দন।

অগণন
তারার চিৎকার
আজ, কোন অন্ধকার

ছিন্ন করে না। বরং
মেঘের মৃদঙ্গ শুনি। কালো রং
ছেয়ে আছে বিশ্ব।

যারা নিঃস্ব
তারাই জ্বালাবে অগ্নি-শিখা।
উদ্ধত কর্ণিকা
মাথা নোয়াবে না জেনে, সংগোপনে
তুমিই দাঁড়িয়েছ বাংলার রণাঙ্গণে।

ঋত্বিক,
আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক
সেরে গেয়েছ জীবনের গান,
হে আমার মৃত্তিকা-সন্তান
তোমাকে আমার চাই।

চাই। কেননা, এক অম্লান সানাই
বাজিতেছে বিশ্বচরাচরে
আর তুমি দুঃখের নিরন্তর, কাঁদিতেছ ঈশ্বর

মানচিত্রের দেশ থেকে দেশে
[শ্রী প্রদীপ্তশংকর সেন, শ্রদ্ধাভাজনেষু]

শহরে নেমেছে অন্ধ বধিরতা, তুমি কোন দূরত্বে যাবে ?

কালো বৈশাখী দিন সমাগত। ঘূর্ণ্যমান অদৃশ্য চাকায়
বেঁধেছি নিজেকে। এবং তোমাকেও দেখি
আবর্তিত মহাশূন্যতায়।

দিনান্তে ফিরে আসি ঘরে। কর্মের প্রহারে
ম্লান। শরীরের ছায়া, সে-ও দেখি আমারই মতো,
অবিকল মানুষের মতো ;
হাড় বাজে ঠন্ ঠন্ ; সিঞ্চিত সেই ঘরে
কংকালও ইন্দ্রিয় লাল বাতি জ্বালে।

নিভে গেছে বাতি, শহরে নেমেছে অন্ধ বধিরতা। এদিকে,
৪০, ৫০ তলা বাড়িঘর
মাথা ফুঁড়ে উঠছে নীলিমায়।

নীলিমায় শহুরে মধ্যবিত্তের সংসার। দ্যাখে
চাঁদ, সূর্যকে পায় আরো কাছে। গান গায়
রবীন্দ্রনাথের। এবং বারান্দার টবে
কেয়ারি বাগান। উপরন্তু প্রকৃতি প্রেমিক।
— শূন্য উদ্যানে ঝরে পাতা। মাঝে মাঝে যায়
পার্কে। এবং প্রাতঃকালীন ভ্রমণের শেষে
মাটির উপকারিতা বিষয়ে সন্তান-সন্ততিকে বলে ; আর বলে :
রাত্রিকালে আমাদের বারান্দা থেকে
শহরের দৃশ্যটা বড়ো চমৎকার !

২

দিনান্তে ফিরে আসি ঘরে। ঘরের স্তব্ধতায় দেখি
এক বিশাল মানচিত্র। মানচিত্রের দেশ থেকে দেশে আবর্তিত আমি
আকাশে বাতাসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, আর আমার শ্রবণ শক্তিকে বধির ক'রে
এক অন্ধ কালকূট খোঁটে দীর্ঘ শূন্যতা।

মধ্যবিত্তের পাঁচালি

ঐশ্বর্যমণ্ডিত অন্ধকার, আর
হীরক-খণ্ডের মতো রাত্রি
এলো আমাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক
ঘরে। লগ্ন হলো দুইবাহু। জন্মান্তর মিশে গেল
মৃত্যুর সমীপে।

উন্মত্ত-বন্দী প্রাণে জাগে আশ্চর্য রূপের শিখা।

২

প্রাণবন্ত তারুণিক নেমেছে পথে। পদধ্বনি শুনি
জীবনের। উচ্চৈঃশ্রবা মানুষের গানে
প্রাণ পায় ঊষর অঙ্গীকার।

দেশ ও দশের মাটিতে, পঞ্চাগ্নি-আলোয়, মিছিলে
আমাদের কর্ষিত অকর্ষিত ভূমিতে
আবিশ্ব ঐকতান।

৩

দগ্ধ প্রাণের চৈত্রে অস্ত গোধূলির গান
স্বচ্ছ প্রেমের বিন্যাসে
অশ্রুময় সৌরভ। ক্লান্ত-তাড়িত মন। অন্ধকার বহে আনে
বিহঙ্গ পাখায়। ঘরে ফেরা রঙীন সন্ধ্যা।

এই তো মধ্যবিত্তের সংসার। মুক্তির আশ্লেষে, ক্ষণিক উল্লাসে আর
লগ্ন বাহুর পেশীতে
জন্মজন্মান্তর।

— আমাদের জীবন-যৌবন বাঁচে, ক্ষুধিত প্রাণে জাগে উন্মত্ত-বন্দী প্রাণ।

আমাদের সংসারে

[শ্রী মনোজিৎ মিত্র, শ্রদ্ধাস্পদেষু]

আমাদের সংগ্রহে তেমন কিছুই ছিল না, নেই —
নগরজীবনের ক্লান্তি, ভাঙা আসবাব, বিকার-বিক্ষোভ আর
কিছু কিছু অনুকাহিনী নিয়ে
এই আমাদের সংসার।

আমাদের সংসারের আরেকটু ইতিহাস আছে —
১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গত্যাগী, এখন
কলকাতায় উদ্বাস্তু।

আমাদের সংসারে একটি ক্রন্দনরত শিশু আছে —
আমরা তাকে সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেব ; দেখে আসবে
পাখি আর প্রকৃতির পাশাপাশি সহাবস্থান।

— আমাদের সংসারে আত্মভুক নগরীর সভ্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

চোখ

ইদানিং আমার চোখ ছোট হয়ে আসছে —
এখন আর আগের মতো সব কিছু ঠিকঠাক
দেখতে পারি না। যেন একটি বৃত্তের মধ্যে
আরেক বৃত্তের কাফনে আবৃত।

ইদানিং আমার চোখ হলুদ থেকে কালো, কালো থেকে
অন্ধ হয়ে আসছে। অথচ,
একদা এই চোখই ধারণ করেছিল বৈশালীর
মহান সভ্যতা। তখন, আমার চোখ থেকে
বেরিয়ে আসত সূর্যের অনল-রশ্মি।

ইদানিং আমার চোখ যুদ্ধ ও ধ্বংসের থেকে যখন
একটি অহিংস গ্রামের দিকে উড়াল দিচ্ছে ; যেখানে
নদী আর পাখির কলতান, কৃষক আর মজুরের সহাবস্থান
তখনই, সাম্রাজ্যবাদের লাল চোখ
গ্রাস করছে শান্ত-সবুজ মানচিত্র।

পর্তুগীজ গ্রামের দক্ষিণে

আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যায় —
গোধূলি-বেলায় আকাশের প্রান্ত জুড়ে
মেঘের বর্ণচ্ছটা। অতিদূরে বিদেশ ভ্রমণে
বেরিয়েছি। যবে সন্ধ্যা নামে এই পর্তুগীজ
গ্রামের দক্ষিণে।

মহাশূন্যের ভিতরে যে ঢেউ,
বাতাসের ভিতরে যে ক্ষয় ; আমাদের
প্রাত্যহিক স্নায়ুতে মুখর নিঃসঙ্গতা আর গাঢ় বেদনায়
জমে আছে এস্ত মহাদেশ।

২

"আমাদের এই সুদূর জন্মভূমি
অন্তহীন বিদেশী পর্যটনে মলিন।
– ঝড়ঝঞ্ঝার মত্ত সাগরে যে নাবিক ধরেছিল হাল,
এখনো কি ফেরেনি" ?

— দুই প্রৌঢ় দম্পতি অন্ধকারে মুখোমুখি
বসে আছে। তারা-ছাওয়া মোর আকাশ। চারিদিকে
নিথর স্তব্ধতা, বাতাসের ক্রন্দন।

৩

"সমুদ্র জলে আজ বড়ো বেশি গর্জন, টাইফুন হবে।"
'কি যে অলক্ষুণে কথা বলো। বোর্ডারিক,
আর কতদিন এই বন্দীদশা, আর কতদিন এই সুশৃঙ্খল
মানব-ব্যবহার ?'

"দ্যাখো, এই ঔপনিবেশিকতা
মৈত্রীর ভাষায় আরো কিছুকাল মেনে নিতে হবে।
সমুদ্রজল আর মদে আমাদের দেশজ ঐকতান
ভেসে গেছে একাকার।

এইভাবে, আরো কিছুকাল ; তারপর
আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের অপেক্ষায় একদিন তারুণ্যে,
বিদ্রোহে, রক্তের জোয়ারে
সমুদ্রজল ফেনায়িত হয়ে উঠবে"।

৪

'ফার্ণান্ডেজ এখনো কি ফেরেনি ?
— সেই সাতসকালে বেরিয়েছে সমুদ্রে
মাছ ধরতে। এখন কতরাত ?
— বড়ো ছেলে মদের দোকান খুলে
অন্যত্র সংসার পেতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর
আমাদের প্রথমা কন্যা লিজিয়া
এখন ক্যাবারে নর্তকী। সুখেই আছে।
এইতো সংসার'।

৫

"সান্তামারিয়া, তুমি দেখে নিও
একদিন ঠিক দোরগোড়ায় সময়
এসে দাঁড়াবে। সার্বিক মুক্তির জন্যে আমাদের
উত্তরাধিকার রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে।"
— 'তাহলে কি আমরা পরাধীন, ভারতের উপনিবেশ' ?
"পরাধীনতার কথা আমি বলিনি। বলেছিলাম :
উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে যে-গণআন্দোলন ; আমারও প্রশ্ন তাই,
তবে কি পরিণামে একদিন বিচ্ছিন্ন হবে, সমস্ত
ভারত ভূখণ্ডে সদ্য স্বাধীন দেশ ?

৬

"একদা পাথর ভাঙতে ভাঙতে বাজিয়েছি গীটার, এখন
রোদ্দুরে যেতে ভয়। বয়স সাতাত্তর, তবু বিলক্ষণ
দেখতে পাচ্ছি ক্রমাগত নদীর ভাঙন আর
দেয়ালে সারি সারি পিঁপড়ের দাগ। ঝড় আসন্ন।

— ভালো কথা, শেখ মুজিবের হত্যার পর, বাংলাদেশে
হত্যা কি এখন নিয়মিত খেলা ?
— যাই বলুন, ভারতে কিন্তু এখনো গণতন্ত্র আছে।"

'আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। দেখবেন, আগামী
কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশে
আমরাই প্রথম সমাজতান্ত্রিক। আর হ্যাঁ,
ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ তো ১৯৭৫-এ আপনিও দেখেছেন।

যাই, দেখা হবে।'

— "এদিকে এলে আবার আসবেন। এই তো দেখলেন,
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়"।

৭

দুই দম্পতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন।
তারা-ছাওয়া সৌর আকাশ। অদূরে ঝাউবন,
সমুদ্রগর্জন।

— জীবনে-মরণে যেন পথের বান্ধব আমি, শুনি
অবিরুদ্ধ কথোপকথন। এদিকে বাড়ে রাত, পল্লবিত অন্ধকার
ক্রমশ ঘিরছে আমাকে। আতিথেয়তার ক্ষণিক চড়াইয়ে
মৈত্রীর ভাষা, প্রাণ পায় অসীম একাকী।

এই সুদূর বিদেশ বিভুঁইয়ে, আমার একাকীত্ব দেশজ গানে
দুর্জয় রিক্ততা প্রাণে-প্রাণে, নিয়ত সংগ্রামে আর জীবনে।

— তাই আমি, প্রাত্যহিকের পদ্মকাননে খুঁজি
শ্রাবণের মেঘ।
ছিঁড়ে যায় বিশ্বজনীনতা বুঝি !
প্রাণ পায় মৈত্রীর ভাষায় আমার বিদেশী সন্ধ্যা, এই পর্তুগীজ
গ্রামের দক্ষিণে।

ইতিহাস

জেলেদের সংসার জলে ভাসে, আমি দেখিয়াছি
চাঁদের সঙ্গে বহুদূর চলে যায় বৈতরণীর দিকে।
আগামী বর্ষায় একবার ঘুরে আসবো মানসসরোবর ; যদি তোমার
শরীর রক্তাক্ত থাকে, সমতল কোনো গঞ্জে গিয়ে
না-হয় সাবানজলে ধুয়ে নিও সব।

এরকম ঘুরে এলে দেখা হবে ঈগলের সাথে। ঈগল পাখিটি
বড়ো ভালো ; কী রকম কুরে খায় মানুষের যকৃত, প্লীহা —
মনে হয়, খুব বেশি রোমান্টিক, তাইনা ? — তুমি কি
জেলীমাছের সঙ্গম প্রণালী দেখেছ, কোনো প্রতিক্রিয়া হয় ?
— ব্রাহ্ম সমাজের গান এখনো আমার ভালো লাগে, যদি পারো
আমার মৃত্যুর সময় একবার গেয়ো।
— আত্মহত্যা ছাড়া সব মৃত্যুই প্রবঞ্চনা ; আমি দেখেছি
চাঁদের সঙ্গে জেলেরা চলে যায় বৈতরণীর দিকে।

"বিবাহ বিচ্ছেদে তুমি কি খুবই দুঃখিত ? — মানবিক সম্পর্ক
শুধু এই
রক্তেরই দান, আর কিছু নয়। আচ্ছা বলো তো, পাঁচসালা
পরিকল্পনার মতো কেন এ-দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয় ?
কেন রাজনীতির আবর্তে বাংলাদেশ আজ মৃতপ্রায় ?
কেন সাম্রাজ্যবাদের দু'টি চোখ ছেয়ে আছে সারা বিশ্ব ?
মধ্যপ্রাচ্যের মহিমায় আমরা কি সত্যিই ধনবান" ?
— এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু কৃষিমন্ত্রীর চেয়ে
চাষা ও মজুর অনেক ভালো জানেন, কী করে ক্ষেতের ফলন
বাড়ানো যায়।

আমি দেখেছি, মেষপালকেরা খালি গায়ে সারারাত
শীতের রাত্রে জেগে আছে ; আমি দেখেছি, ঈশ্বরের চেয়ে ট্রেন ড্রাইভার
অনেক বেশি ঐশ্বরিক ; আমি দেখেছি, মথুরায় রেলডাক শুনে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশ ফিরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।
— জেলেদের সংসারে কেউ কাঁদে না ; পদ্মা মেঘনায় জল নেই ব'লে
চোখ দু'টো আর্দ্র পাথর।

অগ্নিদগ্ধ উৎস

সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ তুমি, তোমাকেই ভালোবাসি আমি।
— পুঞ্জীভূত অগ্নির ভিতরে যে-বাতাস,
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কখনো
দৃশ্যত নয় ; অথচ সম্পূর্ণ জীবনে মিথ্যার পলেস্তরা
সত্যের চেয়ে বেশি।

আমি জানি, কোন ধ্বংসই একদিনে রচিত নয় —
ক্রুর দেবতা গভীর ষড়যন্ত্রে মানুষ
গণগনে আগুনের মধ্যে কীর্তিত হয়েছে। অথচ
আজো ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের
গেলনা। তোমার অভিশপ্ত জীবনের প্রহরে ছিল
ন্যায়, প্রেম, ভালোবাসা। রাজ্যের অধিকতর
কল্যাণে সত্যকেই করেছ উন্মোচন। তুমি অনায়াসে
পারতে সমস্ত ধূলিস্মাৎ করে দিতে। কিন্তু,
দেশ ও মানুষ ভালোবেসে যে সমগ্র জীবনকে তুচ্ছ করেন
আমি বলি ঃ তিনিই মহৎ।
অথচ তোমার নামে নানা অপবাদ
রটায় নিন্দুকে। জানি, অভিসম্পাতের নীরক্ত অবয়বে শুধু
নির্মম উত্তাপ ছাড়া আর কিছু নেই।
— তোমার অনাগত দিনের আলোয় আমার দিবসের পূর্ণতা।

সাংসারিক পুতুল

আমাদের সংসারে একটি পুতুল আছে —
মাঝে মাঝে তাকে আমরা ভীষণ খাইয়ে দাইয়ে, ঘুম
পাড়িয়ে, কখনো সঙ্গে নিয়ে
হেঁটে বেড়াই। কখনো চেয়ারে বসিয়ে বলি :
লক্ষ্মী সোনা, চুপচাপ বসে থাকো, একদম নড়বে না।

ইদানিং পুতুলটি বড়ো বেশি বেয়াড়া হয়ে উঠছিল —
কথা বললে কথা শোনে না, থামতে বললে
থামবে না, যেন গোটা বিশ্বই তার হাতের মুঠোয়।

এত স্পর্ধা ভালো নয় ব'লে দিলুম মাথাটি ছেঁটে।
বললাম : আপাতত তুমি বাক্সবন্দী।

— রক্তহীন মুণ্ডটি এখন মাটিতে লাফিয়ে বলে :
কি যে ন্যায় আর কি যে অন্যায়, কিছুই বুঝি না, ছাই !

কবি ও কবিতা

এখানে কেউ বসেছিল, এই শূন্য আসনে ? — কে, কোনো কবি ?
রেখে গেছে স্মৃতি, কোনো পংক্তি ? — এখন কি পঠিত হয়
কোনো কবিতা, কবিতার দুই একটি চরণ, নাকি 'একদা ছিলেন'
এই ব'লে উল্লেখিত হয় সভায় সমিতিতে ?

এখন আসন দখল করেছে যুবা, কনিষ্ঠ উত্তরাধিকার —
এখন ঘণ্টাধ্বনি তোলে জ্যোৎস্না-আক্রান্ত মেঘ,
এখন বর্ষণ হয় শীত মরশুমে,
এখন গগনবিহারী চিল খুঁটে খায় দীর্ঘশূন্যতা।

কেমন আসন ছিল, কতটুকু ছিল তার দখলে ?
ব্যর্থ রচনা তাকে দিয়েছিল অখ্যাতি ? ময়ূরপংখী নায়ে
গিয়েছিল যমুনায় ? শালবনে পাখি
গেয়েছিল গান অপসৃয়মান জাগরণে ?
নিরন্তর কবি কেঁদেছিল একটি গোপন মনোস্থাপনে ?

এখানে কেউ বসেছিল, খোলা ছিল বিস্তৃত আকাশ —
দেখেছিল চাঁদ, স্বাতী-নক্ষত্র, পর্যটন বাতাস —
স্মরণীয় লণ্ঠনে লিখেছিল : যতদূর চোখ যায়
আলোর জটিলতা দেখি, নিরাসক্ত দীপমালায়।

আতঙ্কহীন কে হাঁটে অশ্রুহিল্লোলে ? কে যায় শ্মশানে,
অধোগামী উৎসবে ?

'আমি ভালোবাসি অসম্ভবে'
ব'লে কেউ দাঁড়াবে না আর, চঞ্চল যাত্রীদল বেছে নেবে পথ, পথিক।
গাড়ি এসে দাঁড়ালে আবার তোমাকেও যেতে হবে ; যেন আগেই ঠিক
ছিল সব, কোনো কিছু অনাবশ্যক নয় , — শুধু
স্বাচ্ছন্দ্যে পড়ে থাকে শূন্য আসন আর বিস্তৃত ব্যর্থ কবিতা !

কবিতার এলোমেলো ভেলা

দূর প্রান্তরে পড়ে আছে ঘর, গার্হস্থ্য-উৎসবে কবিতার
অরুন্ধতী করেছে পান বাংলাদেশী, শর্তহীন।

"আমাকে গ্রহণ করো, আমার দাহ্যতা ;" ব'লে উড্ডীন
জটায়ু বিস্তার করেছে বাহু, অকুণ্ঠিত সমুদ্র-বাহার।

২

জলের ভিতরে মুখ, মুখে আগুনের মতো দাড়ি -
এইমাত্র ফিরেছি ঘরে, ঘরের ভিতরে নারী
বসে আছে উন্মুখ।

অনিদ্রায় কাটে রাত, সাতদিন অনাহারে আমি —
'এখন সোনা নয়, জীবনের চেয়ে মৃত্যুই দামী'
বলে ময়না, আমার ডাহুক।